

মোঃ মুজিবুর রহমান

শিক্ষা আইন নিয়ে কিছু কথা

শিক্ষা আইন, ২০১৩ খসড়া আকারে প্রণয়ন করে এটি যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে জনমত যাচাইয়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন ছাড়া অন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা আইন না থাকায় এটি নিয়ে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরা হল।

শিক্ষা আইনের ধারা ২ এর সংজ্ঞা অংশে 'প্রশিক্ষক', 'প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' এবং 'প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ' সংজ্ঞাসহ পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। ৪ ধারার (১) উপধারায় বর্ণিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কিনা, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। এর সংজ্ঞাও সহজবোধ্য করা প্রয়োজন। ধারা ৮(৫) উপধারায় 'বিদ্যালয়ে' শব্দের পরিবর্তে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে' শব্দমূলক ব্যবহার করা যেতে পারে। ১২ ধারার (১) উপধারায় শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক বা সমাপনী পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উল্লেখ রয়েছে। এটা নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে বর্ণিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সব বিষয়ের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলবে বলে বলা হয়েছে। শিক্ষা আইনের এ ধারা অনুযায়ী যদি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কোনো সুযোগ রাখা না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশিজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা কিভাবে সম্ভব?

১২ ধারার (১) উপধারায় প্রাথমিক সমাপনী সার্টিফিকেট (PSC), জুনিয়র সার্টিফিকেট (JSC), জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেটের কথা (JDC) উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হল, জুনিয়র সার্টিফিকেটকে JSC এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেটকে JDC বলা হলে প্রাথমিক সমাপনী সার্টিফিকেটকে PSC বলা যায় কিভাবে? JSC ও JDC অনুসরণ করে PSCকে বলা দরকার প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেট। শিক্ষানীতি, ২০১০ ও প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণী পাস করাকে 'প্রাথমিক সমাপনী সার্টিফিকেট' বলাও যুক্তিযুক্ত নয়।

ধারা ১৩(১) ও (২) উপধারা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতা এইচএসসি এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতা স্নাতক পাস নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, শিক্ষা আইন কার্যকর হওয়ার পর যখন এইচএসসি'র অস্তিত্ব থাকবে না তখন

শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে এইচএসসি'র পরিবর্তে কী বলা হবে? ধারা ১৪(১) উপধারা অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এবং ৪ উপধারায় মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি পর্যায়ের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানকারী শিক্ষকদের ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন ডিগ্রি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এসব শ্রেণীতে পাঠদানকারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি হওয়ায় তাদের পক্ষে ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ এ ডিগ্রিটি বিএড ডিগ্রির সমতুল্য এবং এর পূর্বযোগ্যতা হল কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি। বাস্তবত, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য দরকার সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইএড) কোর্স। এই সার্টিফিকেট প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) থেকে দেয়া হয়। ডিপ্লোমা-ইন-এডুকেশন ডিগ্রি আগে আইইআর থেকে দেয়া হতো। বর্তমানে এটি চানু নেই।

ধারা ২২গ(৬) উপধারায় ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট' শব্দ তিনটির পরিবর্তে 'মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ' শব্দগুলো যুক্ত করা দরকার।

ধারা ২৫(১) উপধারায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক দক্ষতাসহ অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার ভিত্তিতে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বিলুপ্ত হওয়ায় কিভাবে এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা সম্ভব? ২০ ধারার (১) উপধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হইবে নবম হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বৎসর মেয়াদি'। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নামে কোনো অধ্যায়ও এ আইনে সংযুক্ত নেই। ধারা ৩০(১) উপধারায় বলা হয়েছে, 'মাধ্যমিক অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণী/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হইবে।' এখানেও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি'র কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না। এই আইনের প্রস্তাবনায়ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ২৮(১) ও (২) উপধারায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে Bachelor in Education (B.Ed.) উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হবে Bachelor of Education (B.Ed.) কোর্স। একই ধারার (৩) উপধারায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের এক বছরের মধ্যে বুনিনাদি প্রশিক্ষণসহ চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা বলা থাকলেও তাদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (Continuing

Professional Development-CPD) প্রশিক্ষণের কোনো কথাই উল্লেখ নেই। এটি শিক্ষা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কারণ শুধু বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক শিক্ষক যাতে নির্দিষ্ট সময় পর পর ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক উন্নত দেশে সব পেশার ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ নিতে হয়। সিঙ্গাপুরের উদাহরণ হাতের কাছেই রয়েছে।

ধারা ৩৬(১) উপধারায় 'দক্ষ' শব্দের পরে 'ও বিশেষজ্ঞ' শব্দ দুটি প্রতিস্থাপন করা দরকার। বাগিঞ্জিক উদ্দেশ্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা না করার ব্যাপারে ১১ ধারায় এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরের ব্যাপারে ৪২ ধারায় নির্দেশনা থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিয়ে এরকম কোনো বিধিনিষেধ দেখা যায় না। শুধু ২৩ (১) উপধারায় বলা আছে, বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রশ্ন: প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ায় শিক্ষক প্রশিক্ষণকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে না দেখিয়ে এটিকে পঞ্চম অধ্যায়ের 'বিবিধ বিষয়াবলির' আওতায় (ধারা ৫৬) উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণে মনে হয়, শিক্ষা আইনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কম গুরুত্ব পেয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষক প্রশিক্ষণকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর দেশের সাধারণ শিক্ষার মান নির্ভরশীল। শিক্ষক প্রশিক্ষণকে পৃথক অধ্যায় দিয়ে উল্লেখ করলে এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো দায়িত্ব পালনে অধিকতর স্বচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।

শিক্ষকদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণের সুযোগ না থাকলে যতই শিক্ষা সরঞ্জাম থাকুক না কেন, শিক্ষায় কোনো গুণগত পরিবর্তন আশা করা যায় না। শিক্ষকদের বুনিনাদি প্রশিক্ষণসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন (সিপিডি) প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে আইনের মাধ্যমেই।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্য যারা সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত তাদের চাকরিসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং উচ্চতর বেতন কাঠামোও আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা দরকার। প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ভাতার প্রচলন করা উচিত। বিনাম্যান ১৪টি সরকারি টিচার ট্রেনিং কলেজগুলোয় স্কুলশিক্ষকদের বুনিনাদি প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিক্ষা আইনের ৫৬(৪) উপধারায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে

প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মানোন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ তদারকির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' গঠন করার কথা বলা হয়েছে। দেশে শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে সব ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের কাজ করানো সহজ হবে।

৫৬(৭) উপধারায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিএমএড প্রশিক্ষণ এবং বুনিনাদি প্রশিক্ষণ সাধারণ ধারার শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বুনিনাদি প্রশিক্ষণ সাধারণ ধারার শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রহণের সুযোগ থাকলেও বিএমএড প্রশিক্ষণ একসঙ্গে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ বিএমএড ও বিএড কোর্স দুই ধরনের শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত।

অভিযোগ দায়ের ও শাস্তি প্রশ্ন: শিক্ষা আইনের 'তফসিল ১ : অপরাধ ও শাস্তি' শিরোনামে বর্ণিত ২(খ) উপঅনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ ছাড়া কোনো আদালত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলে গ্রহণ করিবে না।' প্রশ্ন হল, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের কোনো ধারা অমান্য করল কি-না, তা সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ জানবে কিভাবে? ডকুমেন্টার কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার দিয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করা দরকার। 'শাস্তির প্রকৃতি' হিসেবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড অথবা কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দেয়া গেলেও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে কারাদণ্ড দেয়া যাবে? প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড করে কী লাভ? টাকা দেবে কে? প্রতিষ্ঠানের টাকা মানে শিক্ষার্থী বা জনগণের টাকা। আর আইনের কোনো ধারা লঙ্ঘন করলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কারাদণ্ডের বিধান রাখা কতটুকু যুক্তিসম্মত সেটাও ভেবে দেখতে হবে। বিবেচ্যপ্রসূত আইনের অপপ্রয়োগ হবে না, এর নিশ্চয়তা কী? প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা শিক্ষা আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এই আইনের ৫৮ ধারা প্রয়োগসহ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং শৃংখলা ও আপিল বিধিমালা, ১৯৮৫ প্রয়োগের বিধান রাখা যায়। ত্রিশ বছর আগের বিধিমালা সংশোধন করা হোক। কিন্তু কারাদণ্ডের বিধান শিক্ষাক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে বলে ধারণা করি। শিক্ষা আইনে এরূপ শাস্তির বিধান রাখা উচিতও নয়।

মোঃ মুজিবুর রহমান : টিচার ট্রেনিং কলেজের সহযোগী অধ্যাপক mujibur29@gmail.com